বাঙালি মুসলমান
আত্মঅন্বেষণ

ভূমিকা

১.

বাঙালি মুসলমান কারা? এককথায় এর উত্তর এভাবে দেয়া যায়: যারা বাঙালি এবং একই সঙ্গে মুসলমান তাঁরাই বাঙালি মুসলমান। এঁদের ছাড়াও সুদূর অতীত থেকেই এই বাংলাদেশের অধিবাসী অনেক মুসলমান ছিলেন-- যাঁরা ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যানুসারে ঠিক বাঙালি ছিলেন না। আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে এই উঁচু শ্রেণির রুচি, জীবনবোধ বা জীবনদর্শন, মনন ও চিন্তন-পদ্ধতি বাঙালি মুসলমানের থেকে অনেকাংশেই পৃথক ছিল। মূলত বাঙালি মুসলমানেরা ইতিহাসের আদি থেকেই নির্যাতিত একটি মানবগোষ্ঠী। এরাই হয়েছিল আর্যদের বর্ণাশ্রম প্রথার অসহায় শিকার। বাংলাদেশে এরা সংখ্যাগুরু হয়েও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রশ্নে তাদের কোনো মতামত বা বক্তব্য ছিল না। বাংলার মুসলমানরা আর্যদের নিকট একটি পরাজিত জনগোষ্ঠী। কিন্তু যেমন কল্পনা করা হয় ঠিক তেমনভাবে এরা আর্যদেরকে বিনা বাধায় প্রভু হিসেবে মেনে নেননি। বাংলার আদিম সমাজের মানুষেরা সর্বপ্রকারে ওই বিদেশি উন্নত শক্তিকে বাধা দিয়েছিলেন। অবশেষে হেরে গিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের দাসের জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই আর্যশক্তি শক, হুন, পাঠান, ইংরেজদের কাছে পরাস্ত হয়ে তাঁদেরকে মর্যাদার আসন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। কিন্তু নিজেরা বাহুবলে যাদের পরাজিত করেছিল তাঁরাও যে মানুষ একথা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা খুব অল্পই অনুভব করেছিল। আর্যদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি পেতে এরা, মানে আজ যারা বাংলার মুসলমান, তারা প্রথমে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। পরে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পর প্রাচীন আর্যধর্ম নতুন জীবন লাভ করলে বৌদ্ধদের এদেশে ধন-প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পরে যখন মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলামধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঙালি মুসলমানেরা শুরু থেকেই তাঁদের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্দশার হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই ক্রমাগত ধর্ম পরিবর্তন করে আসছিলেন। বারবার ধর্ম পরিবর্তন করার পরেও বাইরের দিক ছাড়া তাঁদের বিশ্বাস এবং মানসিকতার কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। যেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় নি তাঁদের উৎপাদন

পদ্ধতির মধ্যেও। ফলে মুসলমান বা অমুসলমান ক্ষমতায় যে থাকুক না কেন, বাংলার মুসলমানদের তাতে কোনো আসে যায় নি। তারা চিরকাল অন্ত্যজ।

এই প্রচলিত তথ্যের সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন : এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক–কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭)।

বড়লাট লর্ড মেয়ো (জানুয়ারি, ১৮৬৯-১৮৭২) স্যার উইলিয়াম হান্টারকে ভারতীয় মুসলমানরা মহারানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ধর্মত বাধ্য কিনা, এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করে একটি রিপোর্ট দানের নির্দেশ দেন। ব্রিটিশ সিভিলিয়ান স্যার উইলিয়াম হান্টার শাসক জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে এ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ অনুসন্ধান ও আলোচনা করে যে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, তা-ই *The Indian Musalmans* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পুস্তকখানি লেখা হয়েছিল একজন ইংরেজ কর্তৃক শাসক ইংরেজ জাতির কার্যকলাপের সাফাই হিসেবে এবং মুসলিম আজাদী যোদ্ধাদের কার্যসমূহ বক্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সে সবের তীব্র নিন্দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে; তবু পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে সদ্য রাজ্যহারা ও শাসন বিষয়ে সর্ব অধিকারবঞ্চিত ভারতীয় মুসলিমদের অন্তর্জালা এবং হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের মানসে অবিরাম আপোসহীন সংগ্রাম ও সাধনার সুস্পষ্ট চিত্র। পুস্তকখানির প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত মুজাহেদীন ছাউনি সিত্তানা ও মুল্‌কার মুজাহিদদের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রাম-সংঘাত এবং ইংরেজদের বার বার শোচনীয় পরাজয়ের পর শেষে ভেদনীতি ও কূটচালের আশ্রয় নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর ধ্বংস সাধন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে জিহাদী সংগঠনের বিবরণ, যার মারফতে বাংলাদেশ থেকে শুরু করে ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রদেশসমূহ থেকে অজস্রভাবে মানুষ ও টাকা-পয়সা জিহাদী বসতিতে আমদানী হতো। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'জিহাদ করা জায়েয কিনা'; এই তর্কিত প্রশ্নে আলেম সমাজ ও নব্য শিক্ষিত সমাজের সমালোচনা; আর চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ইংরেজ শাসনে মুসলমানদের প্রতি অবিচারগুলির এবং শাসক-মনোভাবসুলভ প্রতিকারের উপায়। সমকালীন মুসলমান, বিশেষত বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয়, আর্থিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল্য ও গুরুত্ব অনেকখানি।

২০০৬ এর সাচার কমিশনের রিপোর্ট ভারতের সব মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক চিত্রের দলিল হিসাবে বিবেচিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা গ্রহণযোগ্যতা পায় নি,

Unfortunate as it is, while Sachar Report, which has clearly laid down a broader picture, made it imperative to gather much fuller and detailed information regarding the status of Muslims, at that time the state response to the urgency appeared to be quite cold if not fully insensitive. Firstly, the then West Bengal Government claimed that the report had not reflected the true status of the Muslims of West Bengal as it depended only selective secondary data; the condition of the Muslims of West Bengal, according to the then Government, was far better than what was reported. Also it claimed to have had commissioned a primary investigation on the subject, but later inquiries by social activists found this claim to be baseless.

বাঙালি মুসলমান কী? এরা কারা? মঙ্গল গ্রহ থেকে আসেনি নিশ্চয়। এরা পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী আর পাঁচটা বাঙালির ন্যায় সাধারণ নাগরিক। সংখ্যায় চারে এক। কিন্তু এই 'মুসলমান/ মুচুমান/ মছলমান/ নেড়ে/যবন' আজও বিপুল সংখ্যক বাঙালি তথা ভারতীয়র নিকট অপরিচিত। মুসলমান নামে তারা কী রকম একটি গন্ধ পায়। মুসলমান আবার বাঙালি হয় নাকি? ওরা তো মুসলমান। বিশেষজ্ঞদের অভিমত পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী 'মুসলমান বাঙালি' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবি রাখে। সহজ কথা, এদের মায়ের ভাষা বাংলা। আর ধর্ম ইসলাম। তাই এরা বাঙালি মুসলমান। এই সরল কথাটি বুঝতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না, বড় বড় 'কেতাব' ঘাঁটতে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসিদ্ধ মুসলমান বিদ্বেষী হলেও তিনি বাঙালি মুসলমানদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এভাবে--'ইংরেজ একজাতি, বাঙালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙালী মুসলমান। চারিভাগ পরপর হইতে পৃথক থাকে। বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য্য' (দ্র. *নিম্নবর্গের ইতিহাস* পৃ. ১৫৮)।

কাজী আবদুল ওদুদ মুসলমানদের অন্তরমুখিতাকে তার প্রবন্ধ 'সম্মোহিত মুসলমান'-এ এভাবে বর্ণনা করেছেন, আধুনিক মুসলমান শুধু পৌত্তলিক নয়; সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতার চরম দশা বলা যেতে পারে--তার মানবসুলভ সমস্ত বিচার-বুদ্ধি, সমস্ত মানস-উৎকর্ষ আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত! সে সম্মোহিত। বর্তমান তার জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন। দিগদেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার

নেই। সময় সময় দেখা যায় বটে সে তার অতীতকালের বীরদের, রাজাদের, ত্যাগীদের, মনীষীদের কথা বলছে। কিন্তু এ শেখানো-বুলি আওড়ানোর চাইতে এক তিলও বেশি-কিছু নয়.... হজরত ওমর ও ইবনে জুবেরের মতো বীর-কর্মীদের, সাদী-ওমর খাইয়ামের মতো মনীষীদের, গাজ্জালি-রুমির মতো সাধকদের, জীবনের অন্তঃস্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনরহস্যের সেই গহনে উঁকি দেবে, এই সম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা কত দুরাশা! তার জন্য একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও ঠিক নয়; শাস্ত্রবচনের পিছনে যে সত্য ও শ্রেয়ঃ-অন্বেষী মানবচিত্তের স্পন্দনের অপূর্বতা রয়েছে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য উপলব্ধির সেই দ্বার তার জন্য যে রুদ্ধ। প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম--স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম... কত নিদারুণ তার জীবনের পক্ষে এই প্রভুর হুকুম তার প্রমাণ এইখানে যে, এর সামনে তার সমস্ত বুদ্ধি বিচার স্নেহ-প্রেম শুভ-ইচ্ছা, সমস্ত স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব আশ্চর্যভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়, সে যে চিরদাস, চির-অসহায়, অত্যন্ত অপূর্ণাঙ্গ মানুষ, এই পরম বেদনাদায়ক সত্য ভিন্ন আর-কিছুই তার ভিতরে দেখবার থাকে না।

কাজী আবদুল ওদুদ এই প্রবন্ধে আরও বললেন, আমাদের দেহকোষসমূহ অক্সিজেন-সংস্পর্শে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হয়, এমনি করেই দেহ সবল ও কার্যক্ষম থাকে, আমাদের চিত্তকেও তেমনিভাবে নব নব জ্ঞান ও প্রেরণার দহনে নিরন্তর দগ্ধ ও সঞ্জীবিত করতে হয়, নইলে জড়তার আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে তা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ও জীবনের পক্ষে অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়ায়--নতুন করে এ জ্ঞানের দহনে আমাদের সমস্ত জড়তা ভস্মীভূত হয়ে যাক; আর আমাদের চিত্তে বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজপথ নেই, জগৎ যেমনি এক স্থানে বসে নেই মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে এক স্থানে স্থির হয়ে নেই– আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদাজাগ্রত চিত্ততার। হয়ত তাহলে আমাদের চোখের সম্মোহন ঘুচে যাবে। তখন জগতের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের পর্যায়ের অবসান হবে....কিন্তু আজকের মুসলমান সত্য ও সত্যসাধকের মহৈশ্বর্যময় প্রকাশের সামনে চকিত সম্মোহিত হয়েছে, জগতের সমস্ত সাধনাকে জীবনগঠনের উপাদানরূপে ব্যবহার করা যে মানুষের চিরন্তন অধিকার, সে-কথা সে শোচনীয়ভাবে বিস্মৃত হয়েছে—বার বার এই কথাটিই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে; একটা বড় সম্প্রদায় হিসাবে এই-ই মুসলমানের চরম দুর্ভাগ্য যে, তার যে সমস্ত পরমাত্মীয় পুর্ণাঙ্গ মনুষ্য-প্রকৃতি নিয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও গভীর

সমাজের মতোই জড়তায় আবদ্ধ। 'কৃষ্ণ বলো, আগে চলো' আর 'সবই আল্লার দান' এসব পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের, পাকিস্তানের, বাংলাদেশের মানুষের মজ্জাগত। সব আলো মেলে শেষে এ আলোতে। একেই আমি বাংলার মুসলমানদের হিন্দুদের অন্তরমুখিতা বলছি। এদের সামনে মার্ক্সবাদের 'গডলেস' পৃথিবীর ধারণার কথা বলা বা বস্তুবাদের বীক্ষণের কথা বলা বা অ্যাবসার্ড থিয়োরিস্টদের প্রসঙ্গ উত্থাপন এক আহাম্মক ছাড়া কেউ করতে পারে না।

এতে কিন্তু আমি আমার হিন্দু-মুসলমান ভাইদের কিছু দোষ দেখি না। তাদের তো অনেকেই অশিক্ষিত, প্রথাগত শিক্ষাই বলুন বা অপ্রথাগত শিক্ষাই বলুন। কিন্তু কেউ কেউ তো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন, ভালো কাজকর্ম জোগাড় করলেন, এবং শেষে গৃহকুলদেবতার কাছে নতজানু হয়ে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন। হে আল্লা, হে ভগবান, মহাভুল আমি করেছি। নানা কুপ্রসঙ্গের অবতারণা আমি বইয়ে পড়েছি। নানা জ্ঞানের কুপ্রস্তাব সামনে এসেছে। প্রভু আমি কিছুকাল এদিক ওদিক মুখ ফিরিয়েছি তোমার থেকে। আমাকে ক্ষমা কর ক্ষমাশীল দয়াময় প্রভু। আমি আমার অর্জিত সব সত্য জ্ঞানের অনুসন্ধান তোমার কাছে বন্ধক রাখলাম। আজ হতে আমি তোমার আলোতেই আলোকিত হবো—এ প্রতিজ্ঞা আমি করলাম। আহমদ শরীফ লিখছেন, শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বদ্ধচিত্তের রক্ষণশীল বা গোঁড়া হয়। এরা অনুদার, অসহিষ্ণু, নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন হয়। শাস্ত্রানুরাগী বলে এরা নতুন চেতনা, চিন্তা, আচার-আচরণ নীতি-নিয়মের বিরোধী। এককথায় এরা পরিবর্তন বিবর্তন বিরোধী, আবর্তিত জীবনকে এরা শ্রেয় ও প্রেয় বলেই জানে। এদের কোনো সংস্কৃতি থাকে না। আচার-আচরণ নিষ্ঠাতেই এরা নিবদ্ধ-দেহে-প্রাণে- মনে-মগজে-মননে। একারণে এরা যান্ত্রিক এবং প্রাণীর জীবনই যাপন করে। মনুষ্যত্ব এদের প্রসারমাণ নয়, মানবতা এদের বিকাশমান নয়। এদের চিন্তা-চেতনা আচার-আচরণ জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি চিরকালই আবর্তিত হতে থাকে (পৃ. ৪০)।

শাস্ত্রনিষ্ঠরা বিজ্ঞানকে ভয় পায়। কারণ শাস্ত্রের অনুমিত সত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত সত্যের মিল নেই। ইহ-পরলোক প্রসূত শাস্ত্রিক জীবনে আস্থা তাদের জন্মগত তথা আশৈশব সংস্কারের অংশ। একে বর্জনের যুক্তি, বুদ্ধি ও সাহস তাদের আয়ত্তে নেই। কাজেই তারা থাকে শাস্ত্রের অনুগত ও বিজ্ঞানের সত্যের বিরোধী। রোমান ক্যাথলিক, গোঁড়াহিন্দু ও মুসলমানরা শাস্ত্রকে জীবনের প্রয়োজনীয় পুঁজি-পাথেয় বলে জানে। শাস্ত্রে যা নেই, জীবনেও তার কোনো প্রয়োজন নেই--এমনি ধারণাবশে ওরা বিজ্ঞানবিমুখ। এজন্যই এরা বিজ্ঞানের অনুশীলনে অনীহ। কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, সন্দেহ মাত্রই তো শাস্ত্রে অনাস্থার সাক্ষ্য-প্রমাণ। তাই বিজ্ঞান বর্জন ও শাস্ত্রানুগত্যই শ্রেয়স বলে মানে। মৌলবাদী মাত্রেই বিজ্ঞানবিমুখ। মনকে চোখ ঠাওরায় এরা (পৃ.৬৫)।

এ কথা বাংলার আটানব্বই শতাংশ মানুষের হৃদয়ের কথা। না হলে, কম বেশি সব প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে দেওয়ালে এত ছবি থাকবে কেন। গলিতে গলিতে এত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে কেন। মাচায়, বারান্দায় এসব নিয়ে তর্ক হবে কেন। মিডিয়াগুলো দিন রাত এত এস দেখাবে কেন। মানুষ খাচ্ছে, তাই। এরা বিজ্ঞানের সব সুযোগ-সুবিধা নিতে মধ্যরাতে লাইন দেয়। ছেলেমেয়েকে বিজ্ঞান-স্কুলে পড়ায়, ডাক্তার-বিজ্ঞানি-আইটি প্রফেশনাল করায়। দীর্ঘায়ু হয় বিজ্ঞানের আশীর্বাদ নিয়ে। আধুনিক জীবনের ভোর থেকে ঘোর কাটে এদের বিজ্ঞানের দানে। কিন্তু মনের দিক থেকে বিজ্ঞানকে মেনে নিতে পারে না। এই দ্বিমুখীতা আধুনিক বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রে স্থূলাকারে প্রকট। মুখে বিজ্ঞান, মনে অজ্ঞান। জীবিকায় বিজ্ঞান, আর মননে বিজ্ঞানবিমুখ। এ সত্য আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বাঙালি মুসলমান বা হিন্দুর মন আদিম ও সংস্কারাচ্ছন্ন। মন্ত্রপাঠ আর বিজ্ঞানের সূত্রপাঠ চলে হাতে হাত রেখে। যত বেশি মানুষ আধুনিক হচ্ছে, তত বেশি সে শাস্ত্রিক হচ্ছে। ফলে চির আবর্তনের পথ থেকে সে মুক্ত হতে পারেনি, পারার আশাও ক্ষীণ। মনের উদারতা নেই, আছে আবদ্ধতা। সম্মোহিত শুধু মুসলমান নয়, সম্মোহিত হিন্দুরাও।

২.

বাংলার সংখ্যালঘু মুসলমানদের অন্তরমুখিতার কথা তো বলা হলো, এবং এর পিছনে নির্দিষ্ট কারণকেও চিহ্নিত করা গেছে। কিন্তু সংখ্যাগুরু বাংলার হিন্দুদের অন্তরমুখিতা কেন? এর উত্তর সত্যই কঠিন। তবে মনে হয় ভাববাদের সুগভীর প্রভাব। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে নানা সংস্কারে-কুসংস্কারে জড়ায়। ধর্মীয় রীতিনীতি সে একেবারে ছোট থেকেই রপ্ত করতে থাকে। কথাবার্তায় ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকবেই থাকবে। এছাড়া আছে ধর্মীয় উৎসবের উন্মাদনা। ফলে ছোট থেকেই সে অনেক অনুশাসনের বেড়া বহন করে বড় হতে থাকে। মুক্ত মনের বা মুক্ত চিন্তার অধিকারী সে হতে পারে না। এখানে মুক্ত বলতে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে চিন্তা করার কথা বলা হচ্ছে। কী করে সে এসব করবে। কারণ তার ব্যক্তিমন ধর্ম নির্ভর। ফলে ধর্মের মায়াজাল ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলে মন্দিরে, মণ্ডপে, ধর্মীয় পুস্তকে সে মুক্তির পথ খোঁজে। হয়তো সে পথের সন্ধানও সে পায়। তাই তার মুক্ত চিন্তার প্রয়োজন নেই। এদের অনেকেই বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু পড়েছে এজন্য যাতে বিজ্ঞান বহির্ভূত কাজকর্মই এদের জীবনের পাথেয় হয়। সেই কবিগুরুর কথা একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়, বিজ্ঞানকে এরা বহন করিল, বাহন করিল না।

কলকাতা শহরের হিন্দুরা বিভিন্ন পেশায় অবাঙালি মুসলমানদের দেখে অভ্যস্ত বলে হঠাৎ কোনও নবাগত মুসলমানকে দেখে বলে ফেলেন, ওই লোকটি

মুসলমান, না বাঙালি? এই অবোধেরা জানেন না যে উভয় বঙ্গ মিলিয়ে বাংলাভাষীদের মধ্যে মুসলমানরাই অনেক বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, সুলতানি আমলেই প্রথম বাংলা ভাষা দানা বেঁধে ওঠে। ব্রিটিশ আমলেও যখন শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিরা ইংরেজিতে তুবড়ি ফাটাতেন, তখন বিধানসভায় মুসলমান সদস্যরাই প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দেবার দাবি তোলেন। তারপর তো পাকিস্তানি আমলে উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তপাত। শিলচরেও বাংলার দাবিতে এগারো জন প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই বাঙালিদের পশ্চিমবঙ্গবাসীরাও তেমন মনে রাখেনি। (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আমি কি বাঙালি? (২০১৫ পৃ. ২০৫-২০৬) পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রকৃত পরিচয় কি? এদের কোন 'লেবেল'টি মানানসই--এক। কেবল 'বাঙালি,' দুই। কেবল 'মুসলমান' তিন। না এ দুটির মিশ্রণের ফলে সৃষ্টি 'বাঙালি মুসলমান'? 'কাস্ট' হিন্দু বাঙালির কাছে বাঙালি মুসলমানের একমাত্র পরিচয় যে সে মুসলমান। তাই বাঙালি মুসলমান যতই বাঙালিত্বের গর্ব করুক, আসলে জাতহিন্দু বাঙালির কাছে বাঙালি মুসলমান বরাবরই খানিকটা 'ময়ূরপুচ্ছধারী কাক' হিসেবে বিবেচিত হয়। "...some members of the urban 'mainstream' Bengali elites construct an idea about the Muslims which takes their religious affinity as their singular identity, completely missing all other identities the strongest among which is their being "Bangali". আবার অবাঙালি উর্দু ভাষী মুসলমানদের নিকট বাঙালি মুসলমানরা নিকৃষ্ট 'শেরেক' মুসলমান হিসেবেই থেকে গেছে। তাই বাঙালি মুসলমানরা এই দুই জটিল পরিস্থিতির চাপে 'চিড়ে চ্যাপ্টা'। অত মারপ্যাঁচ না করে সোজা সাপটা কথাটি এই, বাঙালি মুসলমান সোনার বাংলারই প্রতি 'চার জনের একজন'। বাংলাতে এদের জন্ম ও মৃত্যু, আর এদের মায়ের ভাষা বাংলা। তাই এরা বাঙালি। আর ধর্মের দিক থেকে এরা ইসলামে বিশ্বাসী। তাই এরা মুসলমান। এই দুই মিলে এরা 'বাঙালি মুসলমান'।

বাঙালি মুসলমান বাংলারই মানুষ, সেটাই তো মোদ্দা কথা। আগেই বলেছি বাঙালি মুসলমানরা জন্ম থেকেই জাতহিন্দুর কাছে 'পাত্তা' পায়নি। আর জাতমুসলিমরা মানে উর্দুভাষী শহুরে মুসলিমরা বরাবরই বাঙালি মুসলমানদেরকে 'ল্যাং' মেরেছে। গৌড়ের সুলতান হোসেন শা থেকে মুর্শিদাবাদের সিরাজদ্দৌলার দরবার সবেতেই অবাঙালি হিন্দু আর মুসলমান। সম্মান পেয়েছে বাঙালি হিন্দু। এক মসজিদে নামাজ পড়েও বাঙালি মুসলমানের সাথে অবাঙালি মুসলমানের মানসিক ও বৈষয়িক দূরত্ব কমে নি। এত অযত্ন এত অপবাদ সহ্য করে বাঙালি মুসলমান 'আগাছার' মতো বেড়ে উঠেছে। জাতহিন্দুদের মধ্যে চিরকাল ছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কদর। উত্তর ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাঈজী বাড়ির মহফেল আর

ওস্তাদজীর হাত ঘুরে উঁচুজাতের হিন্দুদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। বাঙালি নিধুবাবু সেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাংলা রূপ দিলেন, নাম হল নিধুবাবুর টপ্পা। অবাঙালি মুসলমানরাও সেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উর্দু রূপান্তর করে গাইছে। কাওয়ালি, গজল, নাত, হামদ। বাঙালি মুসলমানদের কাছে জাত হিন্দুদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রইল অধরা। আবার বাঙালি বলে অবাঙালি মুসলমানদের কাওয়ালি, গজলও রপ্ত করতে পারল না। গ্রামের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সাথে বাঙালি মুসলমানের অবাধ মেলামেশা। তাই লালন ফকিরের বাউল, ফকিরি গান এদের কাছে আপন হয়ে উঠলো। নিচুজাতের ভোলাময়রা, বসন্ত চাঁই আর দেবেন ডোমদের হাত ধরে উঠে আসেন কবিয়াল শেখ গুমানী দেওয়ান। লেটো গানের আসর থেকে জন্ম হয় দুখু মিঞার ওরফে কাজী নজরুল ইসলামের। ব্রাত্যদের গানের আসর আলকাফ জন্ম দেয় সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজকে। মাঝি মাল্লাদের ভাটির টানে নৌকা বাইতে যে ভাটিয়ালি গান গায়, সেখান থেকে সৃষ্টি মহান আব্বাসউদ্দিনের। এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতও বাঙালি মুসলমানদের মনে সে ভাবে সাড়া জাগাতে পারে নি। রাঢ় বাংলার মুসলমান চাষি হিন্দুদের মতো নতুন ফসল ওঠার সময় 'লবান' বা নবান্ন উৎসব পালন করে। এরা নামাজ পড়ে এবং পিরের দরগায় মাটির ঘোড়াও চড়ায়।

'বাঙালি মুসলমান' বা 'মুসলমান বাঙালি' এই দুটো অভিধাই একসময়ে অচল ছিল। মুসলমানেরা 'বাঙালি' হতে পারে না এই বিশ্বাস ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই...এর মূল খুঁজে পাওয়া যায় বঙ্গভূমিতে মুসলমানদের আবির্ভাবের সময় ও প্রকৃতি থেকেই। তাদের বোঝানো হয়েছিল, তাদের আদিভূমি মধ্যপ্রাচ্যে। অতএব তারা বা তাদের পূর্বপুরুষেরা বহিরাগত--বাঙালি নয়। অথচ সত্যটা তো এই: অখণ্ড বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত হিন্দু (ও বৌদ্ধ)। সুতরাং বাঙালি হিসেবে তাদের অধিকার জন্মগত। অনেক শিক্ষিত মুসলমানরা এই পরিচিতিতে খুশি হলেন বটে, কিন্তু নিরক্ষর ও অনগ্রসর মুসলমানেরা জিইয়ে রাখলেন তাদের পুরনো সংস্কারকেই। শিক্ষিত অগ্রসর মুসলমানেরা বলতে চাইলেন 'বাঙালি' বলাটাই কি তাদের পরিচয়ের স্বীকৃতি নয়? এর সঙ্গে 'মুসলমান' যুক্ত করলেই 'হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যর বা মৌলবাদী মুসলমানদের গোঁড়ামি এবং তজ্জাত নানা অপকীর্তি ও সংঘর্ষের বেদনাদায়ক ইতিহাস' তাদের মনে পড়ে যায়, যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে দুই বাংলার অগ্রসর মানুষ। অন্যদিকে 'মুসলমান' শব্দটি বাদ দিলে একটি 'অনৈতিহাসিকতা'-র আভাস মেলে। 'মুসলমান' শব্দটি শুধু ধর্মীয় পরিচয়ে নিঃশেষ নয়, সংস্কৃতিরও একটা অঙ্গ ও প্রেরণা। তা অস্বীকার করা যায় কি? বাংলার মুসলমানদের বাঙালি সত্তার এই যে ধর্মনির্ভর বা ধর্ম-অনুষঙ্গী জীবনযাপন আচার-আচারণ কিংবা স্বভাব ও চলন, সেই সংস্কৃতির বাস্তবতা ও স্বাতন্ত্রকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্মীয়

রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্যের নানা দিককেও ঠাহর করতে হয় তাদের ওই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রতাকে জানতে।

রফিউদ্দীন আহমেদের *The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity* শীর্ষক গবেষণায় বাঙালি মুসলমানের identity crisis তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন :

> The rural masses [Bengali Muslims] were victims of painful culture conflict. The constant harping on extraterritorial links created in their minds a vague, yet persistent, notion that perhaps most, if not all, Muslims were alien to Bengal. Bengal to them thus became a non-Muslim land. The consequent crisis of identity was reflected in a curious distinction: now the Hindus alone were 'Bengalis', The Muslims being only 'Muslims', liberated from all local ethnic affiliations. This odd dichotomy became a part of the Bengali Hindu vocabulary as well. (111-12)

৩.

বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণ সম্পর্কে ডক্টর আরনল্ড বলেন : 'ইসলামের জাতিভেদের বালাই নেই, আর এজন্যেই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণে বলপ্রয়োগের কারণ ছিল না, শান্তিপ্রিয় প্রচারকদের শিক্ষায় তারা সহজে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, ইসলাম প্রচারের সর্বাপেক্ষা স্থানীয় ও ফলপ্রসূ বিজয় হয়েছে সেই সময় সে সব ক্ষেত্রে, যখন মুসলিম রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল ছিল ও যেখানে রাজশক্তির প্রভাব অনুভূত হয়নি, যেমন দক্ষিণ ভারতে ও পূর্বে বাংলায়। বাংলাদেশেই মুসলিম ধর্মপ্রচারকরা সর্বাপেক্ষা বেশি সফলকাম হয়েছিল, ধর্মান্তরিতের বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারক্ষেত্রে কোন সুসংবদ্ধ শক্তিশালী অন্য ধর্মের মোকাবিলায় পড়েনি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সদ্য বৌদ্ধধর্মের উৎখাতকারী শক্তিশালী ব্রাহ্মণধর্মের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইসলামকে, কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ ধর্ম প্রচারককে দুবাহু বাড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল জাতিত্বের যাতাকলে নিষ্পেষিত হিন্দুরা। এভাবে ইসলাম বিনা বাধায়, এমনকি সাদর আহ্বানে অভিনন্দিত হয়ে

স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল প্রদেশে। এখানে ব্রাহ্মণধর্মের ধারক ও বাহক উচ্চ বর্ণহিন্দুদের উৎপীড়ন, অবজ্ঞা ও অমানুষিক ব্যবহারে উত্যক্ত সাধারণ হিন্দুরা সাম্য ও মৈত্রীর একটা মহৎ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করলো ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে; এটা মহৎ ঐশীবাদেরও সন্ধান পেয়েছিল, একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত নতুন সমাজব্যবস্থারও সাক্ষাৎ লাভ করেছিল।' (Dr. Arnold, *Preaching of Islam*, Ch ix.)

১৮৭২ সালে ব্রিটিশ-বাংলায় প্রথমবারের মত লোকগণনা হলে মুসলিম জনসংখ্যার হার সরকার ও শিক্ষিত বাঙালির ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে। এতদিন ধারণা ছিল বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় অনেক কম। জরিপ দেখাল হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যানুপাত প্রায় সমান-সমান। ১৮৮১ সালের দ্বিতীয় জরিপে মুসলিম সংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। স্বভাবতই কৌতূহল ও প্রশ্ন জাগল মুসলিম জনসংখ্যার এই বিপুলত্বের কারণ কী? এরা এল কোথা থেকে কিংবা এদের জন্মগত উৎস কী? শুরু হয়ে যায় এ নিয়ে লেখালেখি। এইচ. বেভেরলি মন্তব্য করেন বাংলার মুসলমানদের উদ্ভব মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের থেকে। কিন্তু ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস ওয়াইজ বললেন অন্য কথা। তাঁর মতে উৎসাহী মুসলিম সৈনিকদের তরবারির ভয়ে ভীতু বাঙালি ইসলামের দিকে ঝোঁকে। এই মন্তব্যের পেছনে ছিল ইংরেজের ভেদনীতির চাতুর্য। সেজন্যই কোরান ও কৃপাণের জোরে ইসলামের বাংলায় আসার তত্ত্ব-উদ্ভাবন। স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। মুর্শিদাবাদ এস্টেটের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি এসব মতের বিরোধিতা করে ফারসি ভাষায় লেখেন *হকিকত-এ মুসলমান-এ-বাঙ্গালাহ* (১৮৯১) নামের বই। ১৮৯৫ সালে এটি *The origin of the Musalmans of Bengal* নামে তিনি অনুবাদও করেন। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বিদেশাগত মুসলমানের বংশধর এবং এদেশে শক্তি দিয়ে ইসলাম প্রচার হয়নি।

জবরদস্তিমূলক ঘটনা কোথাও কখনো ঘটেনি এমনটা স্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেটাই প্রধান হলে কিংবা ধর্মান্তকরণ রাষ্ট্রীয় নীতি হলে এমন কিছু প্রশ্ন উঠে আসে যেগুলোর যৌক্তিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ তথ্য সকলেরই জানা যে দির্ঘকালব্যাপী মুসলিম রাজত্বে বহির্বাংলায় শাসনকেন্দ্র ছিল আগ্রা ও দিল্লি এবং বাংলায় মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। এসব অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। আবার পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলে অনেক বেশি। তলোয়ার যদি মূল নিয়ামাক হত তাহলে এর বিপরীত চিত্রই হত স্বাভাবিক। তাহলে এমনটি কেন ঘটল?

এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ারই কথা, বিশেষত সেই সকল গবেষকের কাছে যাদের লক্ষ্য ভারতবর্ষে ও আলাদাভাবে বাংলায় ইসলাম ও

মুসলমান সমাজ অধ্যয়ন। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে স্বীকৃত গবেষণা বিশেষ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইংরেজি ভাষায় কৃত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বঙ্গদেশ সংক্রান্ত দুটি গবেষণার কথা জানি। একটি করেছেন অসীম রায়, অন্যটি Richard M. Eaton অসীম রায়ের বইয়ের নাম *The Islamic Sincretistic Tradition in Bengal* (1983), আর ইটনের বই *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760* (1993) বাংলাদেশের হাসান শরীফ *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ* নামে বইটির অনুবাদ করেছেন। প্রকাশ করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২০০৮)।

অসীম রায়ের গবেষণার প্রেক্ষণবিন্দু বাংলায় হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় অনুধাবন। সেটি করতে গেলে বাঙালি মুসলমানের জন্ম-উৎস, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ-সন্ধান এবং রাষ্ট্রিক-সামাজিক অবস্থান অন্বেষণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। মুখ্যত এ দুটি দিকই তাঁর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। *জিজ্ঞাসা-র* ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ইসলাম ও বাঙালি মুসলিম সমাজ' ওই প্রতিপাদ্যেরই সারসংক্ষেপিত প্রবন্ধ-রূপ। আসলে অসীম রায়ের কাজের ক্ষেত্র এটিই। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *Islam in South Asia: A Regional Perspective* গ্রন্থের বিষয়ও মূলত তা-ই।

বোঝা গেল শক্তির জোরে এদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়নি। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের বিদেশি উৎসের দাবি সম্পর্কে কী বলা যাবে? এ সম্পর্কে মত প্রকাশের আগে এ সত্য স্মরণে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে আগত বিদেশি মুসলমানরা এখানেই বসতি গড়েছেন। ফেরত যাওয়াদের সংখ্যা নগণ্য। বাংলা সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। বিদেশিরা উন্নাসিকতার কারণে নিজেদের রক্তধারা অমিশ্র রাখতে চাইলেও বাস্তব নানাবিধ কারণে তা সম্ভব হয়নি। আসলে তা সম্ভব হয়ও নি। মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে লিখেছেন স্বাধীন বাংলা আমলেই (১৩৫০-১৫৭৫) দু-তিন পুরুষের ব্যবধানে এরা বাঙালি বনে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন কি না সে-প্রসঙ্গ পরে আসবে। আপাতত বলবার কথা এই যে, বাংলার মুসলিম জনগণের অধিকাংশই দেশীয়দের থেকে ধর্মান্তরিত এবং তাদেরও অধিকাংশ ছিল নিম্নবর্ণের দরিদ্র হিন্দু। পরিসংখ্যান সে-কথাই বলে। ১৯১১ সালের জনগণনাতেও দেখা যায় মুসলিম সমাজের শতকরা ৮৬ জনই কোনো-না কোনোভাবে জমির ওপর নির্ভরশীল।

বাংলায়, বিশেষভাবে পূর্ব বাংলায় মুসলিম আধিক্যের কারণ নির্ণয়ে অসীম রায় চারটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন– ভূ-প্রাকৃতিক, আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয়। মুসলিম জনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন একদিকে যমুনা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা-সুরমাধৌত অঞ্চলে এবং অন্যদিকে গঙ্গার মধ্য ও নিম্ন অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যার ঘনত্ব। এদের বিরাট অংশ

কৃষিজীবী 'শেখ' ও বস্ত্রশিল্প 'জোলা'। অপরদিকে হিন্দুদের মধ্যে নিম্নজাতির নমঃশূদ্র, পোদ ও মাহিষ্যদের আধিক্য। বাংলায় নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে এই জনবিন্যাসের সংযোগ রয়েছে। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব ও দক্ষিণে উর্বর জমির স্থানান্তর ঘটেছে। বাংলার আদি ইতিহাসে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ছিল পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চল। উর্বর জমির স্থানান্তরের ফলে উত্তর-পশ্চিমের পথিকৃৎ কৃষকেরা নতুন উর্বর অঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হন। যৌক্তিকভাবেই ধারণা করা যায় এদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র ও ভূমিহীন।

অগ্রণী কৃষক ও অন্যান্য পথিকৃৎদের প্রচেষ্টায় নতুন অঞ্চলের পত্তন হলে উচ্চ জাতির প্রতিনিধিদের সেখানে আগমন ঘটতে দেরি হয় নি। চিরকালই এটা হয়ে আসছে। বাংলায় আর্যীকরণের পর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, এই নিম্নাঞ্চলেও তা-ই ঘটল। অর্থাৎ এখানকার লৌকিক দেব-দেবতা দক্ষিণ রায়কে নিয়ে লেখা কাব্য *রায় মঙ্গল*-এ (১৬৮৬-৮৭) উচ্চজাতিভুক্ত কবি কৃষ্ণরাম দাস জানিয়েছেন তিনি দেবতার নিজের কাছ থেকে তাঁর প্রচার-আজ্ঞা পেয়েছেন। অর্থাৎ উঁচু জাতির হিন্দু এই দেবতাকে পেলেন ইতরজনের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অসীম রায়ের ভাষায়, '... ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণেই শাস্ত্রভিত্তিক হিন্দু ধর্ম এ অঞ্চলে অবাধ প্রসার লাভ করতে পারেনি। ফলে, এ অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেকখানি অপরিণতি ও শিথিলতা থেকে যায় যা ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ সহজতর করে দেয়।'

তাছাড়া বাংলার ক্রিয়াশীল বদ্বীপ অঞ্চলের আরেকটি বিশেষ অবস্থা এখানে ধর্মান্তরণের পরিপ্রেক্ষিত প্রস্তুত করে দেয়। বন্যা-জলোচ্ছ্বাসের মত নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে অঞ্চলটিতে জমির সীমানা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এই সঙ্গে প্রকট ছিল বিশেষ ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক অবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপযুক্ত শাসনযন্ত্রের অভাব। ফলে ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত এখানে ক্রমাগত কলহ ও হানাহানি চলেছে। অসীম রায় লিখেছেন :

> লৌকিক দেবদেবীরা এই অঞ্চলের কৃষক, কাঠুরিয়া, জেলে ও মাঝিমাল্লাদের মানসিক বল ও সাহস যোগাতে পারত, কিন্তু হিংসা, বিরোধ ও অনিশ্চয়তাময় এই অঞ্চলে এক বিরাট অভাব ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনকারী শক্তি ও পরামর্শদাতার ও পতিত কৃষিজমি উদ্ধারে সমর্থ নেতৃত্বের। এই বিশেষ অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মুসলিম ব্যক্তিত্ব এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে সাহায্য করেন।

এ সকল ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় ও ঐহিক নেতৃত্বসম্পন্ন দুধরনের মানুষই ছিলেন। পরে এঁরা সবাই গণমানুষের কাছে 'পীর' আখ্যায় ভূষিত হয়ে যান। দ্বিতীয়োক্ত

বাংলার নিজস্ব একটি সমস্যাও ছিল এবং সেটিই ছিল বেশি গুরুতর। ভারত ও বঙ্গবহির্ভূত বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভেদ বেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। বহিরাগতরা নিজেদের আশরাফ বা অভিজাত মনে করতেন। সুতরাং স্থানীয়রা 'ছোট লোক', তাদের সবকিছুই অবজ্ঞার যোগ্য। তারা মুসলমান বটে, কিন্তু কেবল সে-কারণে আভিজাত্যের মর্যাদা দাবি করতে পারেন না। উনিশ শতকের অপরার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই সামাজিক সমস্যাটি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। ইসলামের সাম্যনীতিতে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এই বিভেদের পক্ষে প্রথম ওকালতি যাঁর পাওয়া গেছে তিনি পূর্বোক্ত খন্দকার ফজলে রাব্বি। *The Origin of The Musalmans of Bengal* (১৮৯৫) গ্রন্থে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, ধর্মান্তরিতদের সামাজিক মর্যাদা ধর্ম পরিবর্তনের আগের মর্যাদার অনুরূপ এবং তারা কেবল সেই মুসলমানের সঙ্গেই মেলামেশা করতে পারে, যারা তাদের নিজেদের মত একই অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, ফজলে রাব্বি ছিলেন উর্দুভাষী অভিজাত পরিবারের মানুষ।

বিদেশি জন্মের পরিপূরক হিসেবে আশরাফের সাংস্কৃতিক চেতনা ও দৃষ্টি ছিল পশ্চিমমুখী। এর ফলে যে-মনোভাব তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার মূল উপাদান হল ইসলামি ধর্ম-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে বাংলাভাষাকে নিতান্ত অযোগ্য মনে করে সেই ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা। মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই বিদেশি ভাষায় লিপিবদ্ধ তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি জানা-বোঝা সম্ভব হয়নি। ফলস্বরূপ বৃহত্তর মুসলিম সমাজে স্তরগত বিভাজনের দূরত্ব বরং বৃদ্ধিই পায়। অসীম রায়ের মতে,

> 'প্রধানত ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের এই অভ্যন্তরীণ দূরত্ব লাঘব করার উদ্দেশ্যে এক বাঙ্গালী মুসলিম লেখকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যাঁরা বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলিম সাহিত্য রচনার গৌরবই মাত্র দাবী করার অধিকারী নন, যাঁরা এক সমন্বয়ধর্মী ইসলামীয় ঐতিহ্যধারার সৃষ্টি করে বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতির দুই স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযোগস্থাপনেও প্রয়াসী হন।'

এই প্রয়াস কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না। ভাষার বাধা অতিক্রম করা কঠিন তো ছিলই, তার চেয়েও কঠিন ছিল মুসলমানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের রূপকল্প, বিশ্বাস ও আদর্শের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তার রূপান্তর ঘটানো। প্রতীক, রূপক, উৎসব, পালাপার্বণ, গীত, নাট্য; আখ্যান ও উপাখ্যানময় বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করার পক্ষে ইসলামের সহজ সরল ও অনাড়ম্বর রূপ অনুকূল ছিল না। তাই প্রয়োজন ছিল আরবি-ফারসি গ্রন্থাবদ্ধ ইসলাম ও

মুসলিম ঐতিহ্যকে বাংলার পটভূমিকায় উপস্থিত করা। মোটকথা, বাঙালি জনগণের পরিচিত ভাষা ও রূপে ওই ঐতিহ্যধারাকে নতুন ছাঁচে ঢালা। মুসলিম কবিগোষ্ঠী এই কঠিন দায়িত্বই কাঁধে নিয়েছিলেন। এঁদের রচনাসমূহ পর্যালোচনা করে অসীম রায়ের মনে হয়েছে, তাঁরা চূড়ান্ত সাফল্যই লাভ করেছেন। 'চূড়ান্ত' হয়ত এই অর্থে যে তাঁদের রচনাগুলো আপাতদৃষ্টিতে আরবি-ফারসি, কখনো হিন্দু কাব্যের অনুবাদমাত্র।

প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বের মুসলমান কবিদের এসব কাব্যকে অসীম রায় 'পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচয় দিয়েছেন। এ অভিধা ঠিক নয়, যদিও এই নামে মুসলমান কবিদের লেখা এক ধরনের কাব্য আছে। তাকে 'দোভাষী সাহিত্য'ও বলা হয়েছে। সে পরিচয়ও অযথার্থ। কেননা এগুলোর ভাষা মাত্র দুটি নয়, একাধিক-বাংলা, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি। ভাষারীতির দিক থেকে সেজন্য আনিসুজ্জামান এগুলোকে 'মিশ্র ভাষারীতির কাব্য' বলেছেন। তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*-এ ওই নামে একটি অধ্যায় আছে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে এই জাতীয় কাব্যে মিশ্র শব্দের ছড়াছড়ি, এমনকি বাংলা শব্দবিহীন পঙ্‌ক্তিও বিরল নয়। যেমন, 'ভেজ আয় রব মেরে দরুদ ছালাম/আপনে পিয়ারে নবী পার ভেজ মুদাম।' এই গোত্রের কাব্যের পুথি বা পুঁথি নাম হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে কলকাতার সস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত 'বটতলার পুঁথি' পরিচয়েরই হয়ত সুভাষিত রূপ পুঁথি সাহিত্য। এর যথার্থ বিকাশকাল ১৭৬০ খ্রি. থেকে ১৮৬০ খ্রি. পর্যন্ত যে সময়টা কবিওয়ালা শ্রেণির সাহিত্যকর্মীদেরও বিকাশপর্ব। অসীম রায়ের অবলম্বন এর পূর্ববর্তী কাব্যধারা।

এবার সংস্কৃতি-সমন্বয় সম্পর্কে কিছু কথা। অসীম রায় জানিয়েছেন নামাজ, ওজু, গোসল, রোজা, জানাজা ইত্যাকর শাস্ত্রীয় নিত্যকর্ম ছাড়া মুসলিম কবিদের অন্যান্য রচনায় স্থানীয় প্রভাব ও সমন্বয়সাধক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে মূল রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে হয়ত এর গদ্যবিবরণ তিনি দিয়েছেন। বিষয়টি অনুধাবন করতে তাতে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু আমাদের মনে হয় কবিদের সমন্বয়সাধক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কখনো কখনো ভিন্ন একটি দৃষ্টিও উঁকি দিয়েছে। যেমন, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদের সমকালীন আরবে মুসলিম-অমুসলিমের সংঘাত হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিরোধ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম-বিরোধী আবু জেহল হিন্দু নেতারূপে উপস্থাপিত হয়েছেন। এর ব্যাখ্যা হিসেবে অসীম রায় লিখেছেন, 'মুসলিম আখ্যানের বিষয়বস্তুকে বাঙ্গালী মুসলিম জনগণের কাছে সুবোধ্য ও জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে লেখকগণ সুপরিচিত উদাহরণ ও তুলনার আশ্রয় নিয়েছেন।' বিষয়টিকে অতটা সরল দেখা যায় বলে মনে হয় না। এর পেছনে মুসলিম-মনের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গূঢ় কারণ নিহিত থাকা অসম্ভব নয়।

৪.

বাংলায় বসবাসকারী, বাংলাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয় নিয়ে একাডেমিক আলাপের সূচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ সালে *বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা* শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ দিয়ে। তিনি এখানে দাবি করেন যে, বাংলার মুসলমান অধিকাংশই নিম্নশ্রেণির এবং কৃষিজীবী এবং অতি অবশ্যই এরা সম্ভ্রান্ত বা রাজবংশীয় না। কারণ রাজার বংশ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করবে আর প্রজার বংশ উচ্চশ্রেণিতে থাকবে এটা বাস্তবসম্মত নয়। আবার এটাও সম্ভব নয় যে, বহিরাগত শাসকের সাথে আসা সামান্য-সংখ্যক মুসলমানের বংশবিস্তার করে বাঙ্গালার অর্ধেক জনসংখ্যায় পরিণত হবে। এই থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'বাংলার নিম্নশ্রেণির কৃষিজীবী মুসলমান নিশ্চয়ই স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে'। এরপরের মাসে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' শিরোনামের প্রবন্ধে তিনি ভূমিকাতেই উল্লেখ করেন যে, বাংলার অধিবাসী এবং বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর অর্ধেক মুসলমান। আবার প্রবন্ধের শেষে তিনি মুসলমানদেরকে বাঙালি জাতির মধ্যে চারটি আলাদা ধরনের একটি হিসেবে উল্লেখ করেন যারা অন্য তিনটি ধরন (আর্য, অনার্য এবং অনানার্য) থেকে আলাদা। তবে পুরো প্রবন্ধের আলোচনা ও বিশ্লেষণ জুড়ে আছে শুধুই বাঙালি হিন্দু জাতি কীভাবে আর্যরক্তের উত্তরাধিকারী হয়েছে, আর সেজন্য তাদের গর্বিত হওয়ার যুক্তি। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র একইসাথে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বাঙালি জাতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন বাংলায় বসবাস এবং মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার কারণে, কিন্তু হিন্দুদের থেকে আলাদা জ্ঞান করেছেন এদের মধ্যে আর্যরক্ত না থাকায়। এরপর থেকেই স্কলাররা বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। সাধারণভাবে এই বিতর্কে তিনটি মতবাদকে চিহ্নিত করা যায়। প্রথম মতটি আসে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের ভেতর থেকে। ইউরোপীয় স্কলারদের মধ্যে 'আরবে তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রচারের তত্ত্ব' অনুসরণ করে এরা দাবি করে যে, বাংলায় মুসলমান সুলতানদের শাসনামলে রাজশক্তির ব্যবহার করে নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠীকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এই দাবির মধ্যে অনুচ্চারে এই ধারণা থেকে যায় যে, অন্যান্য বাঙালি হিন্দুর মত বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীও আদতে হিন্দুই। কিন্তু নিম্নবর্ণ বা শূদ্র পরিচয় স্বভাবতই শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মেনে নেওয়ার কথা নয়। শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকেই পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের পারিবারিক ইতিহাস উপস্থাপন করে দেখাল যে, তারা বিলক্ষণ শূদ্রবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত নয় বরং বাংলার বাইরে থেকে মাইগ্রেট করে এসেছে। কেউ মুসলমান বিজেতাদের সাথে রাজ-কর্মচারি হিসেবে, কেউ ব্যবসায়ী হিসেবে আবার কেউ ইসলাম প্রচারের

জন্য। মোটকথা, মুসলিম স্কলাররা যথাসম্ভব জোরালোভাবে দাবি করল যে, তারা নিশ্চয়ই বাংলার বাইরে থেকে মাইগ্রেট করে এসেছে। উপরন্ত এই দাবির মধ্য দিয়ে তারা এই অনুমানকেও ভুল প্রমাণ করতে তৎপর হল যে, মুসলমান জনগোষ্ঠী বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে শূদ্রবর্ণের উত্তরাধিকারী নয়। এই দুই মতবাদের বাইরে ছিল ইংরেজ স্কলারদের উদ্ভাবিত তৃতীয় একটি মতবাদ। এরা দাবি করল যে, ইসলামের সাম্যবাদী (তথা, ধনী-গরীব ভেদাভেদহীন) চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু ধর্মের কঠোর বর্ণপ্রথার যাঁতাকল থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে শূদ্রদের মধ্য থেকে ব্যাপকহারে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। তারা এই মতবাদের পক্ষে বেশ কিছু নৃতাত্ত্বিক গবেষণাও সম্পন্ন করল যেখানে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলির সাথে শূদ্র এবং নিম্নবর্গের আদিবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে মুসলমান জনগোষ্ঠীর অবস্থান নিয়ে আলোচিত এই তিনটি মতবাদের সবগুলোই দাঁড়িয়ে ছিল মূলত ইউরোপের আধুনিক শিক্ষার মধ্যে জাতীয়তাবাদ নিয়ে প্রচলিত তত্ত্ব এবং তার অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত যুক্তির ওপর। এগুলোর সপক্ষে বাস্তবভিত্তিক (empirical) তথ্য ছিল খুব সামান্যই। যে কয়টি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ছিল, সেগুলোও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা এবং প্রত্যয়গত দুর্বলতার কারণে ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও এই তিনটি মতবাদ বাঙালি মুসলমানের জাতীয় পরিচয় নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যে প্রায় চিরস্থায়ী আসন করে নেয়। বর্তমানে অনেকেই বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর পরিচয় নিয়ে লেখালেখি করেন, বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও টকশোতে আলোচনা করেন। কেউ কেউ এই বিষয়ে গবেষণাও করেন বলে দাবি করেন। তাদের কারও কারও লেখা বই জনপ্রিয় হয়ে পুরস্কার পেয়েছে, আবার কারও বই পুরস্কার পেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের পরিচয় নিয়ে বিতর্ক চলছে সমানতালে। তার মানে হল এই, এত এত লেখালেখি, আলোচনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কোনোটাই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। আজ থেকে ১৫০ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বাঙালি মুসলমানের জাতীয় পরিচয় নিয়ে যে সংশয় ছিল, আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বাঙালি মুসলমান কখনো বাঙালি, আবার কখনো মুসলমান এই দোলাচলের মধ্যে একবার পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগ দিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, আবার কিছুকাল পরেই আরেকটা রক্তক্ষয়ীযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু জাতীয় পরিচয় নিয়ে সেই সংশয় থেকেই গেছে। এর সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের বদলে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রিয় ফলাফল বয়ে নিয়ে আসছে।

বিগত ১৫০ বছরে শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে, গবেষণায় অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একই সাথে জাতীয় পরিচয় নিয়ে একাডেমিক জগতে নতুন নতুন প্রত্যয়

এসেছে। গবেষণায় যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন কলাকৌশল। উপরন্তু জাতীয়তাবাদের অভিজ্ঞতায় নানা ধরনের বিবর্তন ঘটেছে। এরই অনিবার্য ফল হিসেবে বাঙালি মুসলমানের জাতীয় পরিচয় নিয়ে একাডেমিক আলাপেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন, প্রচলিত তত্ত্বীয় মতবাদগুলোর পাশাপাশি তথ্যের ভিত্তিতে কেউ কেউ গবেষণা শুরু করেছেন। এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস বিষয়ক তথ্য বলতে হাতের কাছে মজুদ ছিল সেই সমাজের রচিত সাহিত্য। অতএব, সাহিত্যের পাঠ ও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক পরিচয় নির্ণয়ের গবেষণা দেখা যায়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের গবেষণা যা *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* নামক বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় অন্যতম জনপ্রিয় প্রবন্ধ আহমদ ছফার *বাঙালি মুসলমানের মন* একই ধারায় সাহিত্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই রচিত। তবে বাঙালি মুসলমান সমাজের পরিচয়ের অন্বেষণে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাটি করেছেন অসীম রায়, যা ১৯৮৩ সালে *The Islamic syncretistic tradition in Bengal* নামের বই হিসেবে প্রকাশিত হয়।

জাতীয় পরিচয় নিয়ে একাডেমিক আলাপের সূচনাকালের মতবাদগুলোর মধ্যে বিদ্যমান একটা অনুচ্চারিত অনুমান ছিল এই যে, হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় হিসেবে সম্পূর্ণ আলাদা এবং কঠোরভাবে সংগঠিত পৃথক সামাজিক বর্গ। অসীম রায় প্রথমে যুক্তি দিয়ে প্রচলিত তিনটি মতবাদকেই ভুল প্রতিপন্ন করেন। এরপর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তিনি দাবি করেন যে, বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়েছে বাংলার আদি অনার্য জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকে। এই জনগোষ্ঠীর আবির্ভাবের কালে সামাজিক নেতৃত্বের স্থানে ছিল মুসলমানরা। সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে এই কৃষিসমাজ থিতু হলে নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা কালক্রমে পিরের মর্যাদা লাভ করেন, যদিও তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যকই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এর পরের পর্যায়ে মুসলিম সাহিত্যিকরা বাইরের আরবি-ফারসি ইসলাম আর স্থানীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের সম্মিলনে এই সমাজের জন্য একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে নিয়েছেন। এই সাহিত্যিকদেরকে অসীম রায় নাম দিয়েছেন সাংস্কৃতিক দূতিয়াল। কারণ, এরা গ্রামীণ অশিক্ষিত চাষাভুষা মুসলমান জনগোষ্ঠীর সাথে নগরবাসী শিক্ষিত মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করেছিল।

অসীম রায়ের গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা প্রচলিত তিনটি মতবাদ থেকেই মৌলিকভাবে আলাদা। তত্ত্বনির্ভর এবং যৌক্তিক, কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্যবিহীন এই মতবাদগুলোর তুলনায় অসীম রায়ের তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর ব্যাখ্যা স্বভাবতই শিক্ষিত সমাজে অধিক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এর প্রমাণ, একাডেমিক আলোচনায় পিরের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর এবং বাঙালির সমন্বয়ী ইসলামের স্বীকৃতি। কিন্তু

যেভাবে এই প্রত্যয় দুটোকে বর্তমান আলোচনা ও বিতর্কে ব্যবহার করা হয়, তা অসীম রায়ের প্রস্তাবিত ধারণা থেকে ভিন্ন। যেমন, অসীম রায় পিরের মাধ্যমে এটি মুসলিম সমাজের উদ্ভবের কথা উল্লেখ করলেও শুদ্ধিকরণের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব না হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে মুসলমান সমাজনেতারা কালক্রমে পিরের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমাদের বিশেষজ্ঞদের দাবি করেন যে, পির-দরবেশদের ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজের উদ্ভব হয়েছে। আর এজন্য এই ইসলামকে তারা সুফি-ইসলাম বলেও অভিহিত করেন।

অন্যদিকে অসীম রায়ের সমন্বয়ের ধারণাকেও ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, বাঙালির সমন্বয়ী ইসলামের প্রবক্তারা দাবি করেন যে, বাংলাদেশের ইসলাম হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং আরও অন্যান্য স্থানীয় অনার্যধর্ম থেকে নানান উপাদানকে আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে একটা উদার সংস্কৃতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থাৎ, বাঙালি মুসলমান সমাজ সূচনালগ্নে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করলেও হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি থেকে নানান উপাদান আত্মস্থ করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি উদার জনগোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে যা বহিরাগত রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ থেকে ভিন্ন। কিন্তু অসীম রায়ের মতে, এই সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্রক্রিয়াটি ছিল অনেকটা ক্ষুদ্র পরিসরে। সাহিত্যের উপাদান ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তিনি দেখেন যে, এই সমন্বয়ের লক্ষ্য ছিল কৃষিজীবী পল্লির আরবি-ফারসি না-জানা অশিক্ষিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর সাথে নগরবাসী শিক্ষিত অভিজাত মুসলমানের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল এই যে, অসীম রায়ের প্রস্তাবিত সমন্বয়ের ধারণাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এবং সেটিকে সাধারণীকরণ করে বাংলার অপরাপর সকল অমুসলমান জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর পরিচয় নিয়ে আরেকটি মুল্যবান গবেষণা হচ্ছে রিচার্ড ইটনের *The rise of Islam and the Bengal frontier,* 1204-1760, যা ১৯৯৩ সালে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার অব্যবহিত পরেই ইতিহাস গবেষণায় আমেরিকার একাডেমিক জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ চারটি পুরস্কার জিতে নিয়ে এই বই ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে সাড়া ফেলে। অসীম রায়ের মত এই গবেষণায় রিচার্ড ইটনও দাবি করেন যে, বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে জংলা ভূমিতে কৃষি-সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় অনার্য জনগোষ্ঠী এবং মুসলিম পাইওনিয়ারদের সমন্বয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তাছাড়া সামাজিক ইতিহাস গবেষণার পদ্ধতি এবং তত্ত্বের প্রয়োগ এবং নানা ধরনের ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যবহারের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী কোথা থেকে এসেছে এবং